নারীবাদের ধারণা ও ভ্রান্ত ধারণা

চিররঞ্জন সরকার

যে যার স্বার্থ ও সুবিধামতো যেমন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ব্যবহার করেন; ইদানীং দেখা যাচ্ছে, নারীবাদও একই সমস্যায় আক্রান্ত। যে যার মনমতো নারীবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করছেন, নারীবাদের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

আমরা ছাত্রজীবনে যখন নানা ধরনের 'বাদ' নিয়ে মাথা ঘামাতাম, যেমন ভাববাদ, বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ, মার্কসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ, উত্তরাধুনিকতাবাদ, বিনির্মাণবাদ, কাঠামোবাদ, উত্তর কাঠামোবাদ– তখন কত না 'বাদ'-এর চর্চা করেছি। এর মধ্যে নারীবাদও ছিল। নারীবাদ সম্পর্কে প্রথম যখন ধারণা পাই, তখন কিন্তু যথেষ্টই আলোড়িত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা মতবাদ! নারীবাদ নিয়ে আমার এই উপলব্ধি একটুও বদলায় নি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় অনেককেই দেখেছি, এই মতবাদের অপচর্চা করতে ও অপব্যাখ্যা দিতে।

অ্যাকাডেমিশিয়ানরা একটু কঠিন করে নারীবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে নারীবাদ হচ্ছে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন ধারণা, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নৈতিক দর্শন, যা মূলত নারীর অভিজ্ঞতা দ্বারা সৃষ্ট বা অনুপ্রাণিত।

বেশিরভাগ নারীবাদীই পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিরাজমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন (নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান বিবেচনায়)। কেউ কেউ মনে করেন, জেন্ডার ও সেক্স-এর পরিচিতি, যা পুরুষ এবং নারী হিসেবে পরিচিতি দান করে, তা সামাজিকভাবে নির্মিত হয়। নারীবাদীরা বৈষম্যের কারণগুলো সন্ধানের পাশাপাশি কীভাবে সমতা অর্জন করা যায়, সেই পথ অনুসন্ধান করেন এবং লিঙ্গভিত্তিক পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন ও সমালোচনা করেন। সহজ কথায়, নারীবাদ নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমতায় বিশ্বাস করে। একইসঙ্গে একজন ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় নিরূপণে লিঙ্গ পরিচয় যাতে কোনো পূর্ব নির্ধারিত ফ্যাক্টরে পরিণত না হয় এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এই জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে।

খুব সহজভাবে ভাবলে এবং দেখলে একজন মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকারের দাবি হলো নারীবাদ। আধুনিক সংজ্ঞায় নারীবাদ হচ্ছে পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর হীন মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন এবং এই অবস্থা পরিবর্তনে নারী ও পুরুষের সচেতন সক্রিয় উদ্যোগ। বিশ্বজুড়ে যে বিদ্যমান শ্রম বিভাগ পুরুষের ওপর রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এসব সামাজিক পরিমণ্ডলের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং নারীকে গোটা সংসারের বোঝা বহনকারী বিনা মজুরির 'বাঁদিগিরি'র দিকে ঠেলে দেয়, তাকে চ্যালেঞ্জ করে নারীবাদ। নারীবাদ বিরাজমান ক্ষমতা কাঠামো, আইনকানুন, রীতিনীতি যা নারীকে বশ্য, অধীনস্ত ও হীন করে রাখে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

নারীবাদ হলো একটি সামাজিক আন্দোলন, যা নারীর গৎবাঁধা ভূমিকা ও ভাবমূর্তির পরিবর্তন, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ এবং পুরুষের মতো নারীর সমান অধিকার অর্জনে সচেষ্ট হয়। অনেকে ভ্রান্ত ধারণার বশে নারীবাদকে 'পশ্চিমা অ্যাজেন্ডা' বা 'পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর প্রাধান্য স্থাপন' বলে মনে করে। পিতৃতন্ত্রের ঠিক বিপরীত কোনো কিছু বলে বিবেচনা করে নারীবাদকে। কিন্তু নারীবাদ অর্থ কখনোই নারীর প্রাধান্য বিস্তার নয়। নারীবাদ তাই নারীদের আন্দোলন নয়, বরং নারীদের জন্য আন্দোলন, নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সে জন্য এটি নারীকে পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা-প্রত্যাশী পুরুষেরও আন্দোলন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নিজেকে নারীবাদী বলেই মনে করি।

আসলে নারীবাদ হলো পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর ওপর শোষণ-নিপীড়ন সম্বন্ধে সচেতনতা এবং এই অবস্থা বদলের লক্ষ্যে নারীর (সেই সঙ্গে পুরুষের) সচেতন প্রয়াস। নারীবাদ তাই কেবল সমতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম নয়, যা নারীর বিরুদ্ধে বিদ্যমান বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে সমান অধিকার ও আইনি সংস্কার সাধনের জন্য তাড়িত করবে। বরং তা পরিবারে নারীর অধস্তনতার মূল বিষয়গুলো মোকাবেলা করে এবং বিরাজমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

কী এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশে অনেকেরই মনে 'নারীবাদ' ও 'নারীবাদী'দের নিয়ে প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'নারীবাদ' শব্দটি নিয়ে বেশ নেতিবাচক ধারণা জন্ম নিয়েছে। যেমন কারো কারো ধারণা, যিনি 'নারীবাদী' চিন্তাচেতনা নিজের ভেতরে লালন করেন, তিনি উচ্ছন্নে-যাওয়া কেউ! তিনি সমাজ-সংসারের ধার ধারেন না! পুরুষের ওপর নারীর আধিপত্য বিস্তার করতে চান বা পুরুষবিদ্বেষী হন, অথবা পুরুষদের প্রতিপক্ষ ঘোষণা করে সারাক্ষণ যুদ্ধংদেহী মনোভাব

নিয়ে থাকেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে কেউ তা হতে পারেন, কিন্তু নারীবাদের সংজ্ঞা থেকে আমরা যে বিষয়টা বুঝি তা হচ্ছে, নারীবাদীরা পুরুষের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য লড়াই বা আন্দোলন যাই বলি না কেন তা নিয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। প্রবলভাবে পুরুষশাসিত সমাজসৃষ্ট লিঙ্গবৈষম্য উপড়ে ফেলে কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক, কী অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেন। যতদিন পর্যন্ত এই সমতা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিকভাবে নিশ্চিত না হচ্ছে, ততদিন নারীবাদীদের দাবি আদায়ের জন্য এই আন্দোলন চলতেই থাকবে। এটা শুধু নারীবাদের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের সর্বস্তরের তুলনামূলকভাবে কম সুবিধাপ্রাপ্তরা নিজেদের বঞ্চিত বোধ করেন স্বাভাবিক কারণেই। যার জন্য নিজেদের দাবি আদায়ের পথে বাধাবিপত্তি ডিঙানোর জন্য তাদের দৃঢ় ও শক্তিশালী অবস্থান নিতে হয়।

একথা ঠিক যে, আমরা যারা একটা সুশীল, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজের পরিসরে চলাফেরা করি, খবরের কাগজ পড়ি, সংবাদ-মাধ্যমে চোখ রাখি, ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের চলাচল জাহির করি, অর্থাৎ এই 'আমরা' যাঁদের নাকি গোটা সমাজ ব্যাপারটা সম্পর্কেই একটা সম্যক ধারণা রয়েছে, এবং বক্তব্য পেশ করবার অধিকার রয়েছে, তাঁরা কিন্তু পুরুষতন্ত্র, নারীর অধিকার নিয়ে সর্বদাই যথেষ্ট চিন্তিত থাকি। আমাদের এই সমাজচিন্তার অনেকটা জুড়েই থাকে লিঙ্গনির্মাণ-সংক্রান্ত বিবিধ জটিল প্রকল্প।

একটু সচেতনভাবে দেখলে বোঝা যায় যে আমাদের এই আলোকপ্রাপ্ত নারীচিন্তার ধারাটি দ্বিবিধ। একদিকে আছে নারীবাদ-চর্চার অ্যাকাডেমিক ধারা— কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিংবা নারীচর্চা কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনাচক্র, পঠন-পাঠন, গবেষণা, জটিল সামাজিক সন্দর্ভের বিনির্মাণ। এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীত, কিন্তু পুরুষতন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম সমালোচনার এই অভিজাত প্রতিবাদের প্রকল্প প্রতিদিনের নারীচিন্তা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। ফলে নারীবাদ একটা সরল 'বাইনারি'র ভেতরেই আবর্তিত হয়ে চলেছে, তা সিনেমা-সিরিয়ালেই হোক, দৈনন্দিন যাপনেই হোক।

দ্বিতীয় ধারাটি সামাজিক, বিশ্বব্যাপী নারী-আন্দোলনে শরিক হওয়ার মহাযজ্ঞ। এর আবার অনেকগুলো দিক রয়েছে। একদিকে যেমন রয়েছে বিভিন্ন নারী সংগঠন, যারা প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রামে-গঞ্জে ছুটে বেড়াচ্ছে। যেখানে অবমাননা হচ্ছে, নারী নির্যাতন, বা ধর্ষণ হচ্ছে, সে সব জায়গায় গিয়ে তাঁরা নির্যাতিতার পাশে দাঁড়াচ্ছেন, বল-ভরসা

দিচ্ছেন, তাঁর হয়ে কোর্ট-কাছারি করছেন, শত্রুপক্ষকে এবং সেই সুবাদে প্রত্যেক পুরুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আর একদিকে রয়েছেন আদ্যন্ত নাগরিক নারীবাদী, অ্যাকাডেমিক নারীবাদ থেকে সরলীকৃত কিছু ধারণা খুবলে নিয়ে সমাজের গায়ে নিক্ষেপ করছেন। তারা 'মি টু' আন্দোলন করছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিবাদ লিখছেন, লেলিহান প্রতিবাদে চমকে-চমকে উঠছে উদ্ধত পুরুষতন্ত্র। কিংবা, যৌনকর্মীদের পক্ষে কথা বলছেন, 'হিজড়া'দের হয়ে যুক্তি দিচ্ছেন, পুরুষতন্ত্রের ঘাড় ধরে শিখিয়ে দিচ্ছেন দেহতত্ত্ব এবং নারীদেহের চাহিদা এবং অধিকার সম্পর্কে কিছু কড়া যুক্তি। আর, পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা নিজেদের আশু ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় জেরবার হয়ে যাচ্ছে!

প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া জরুরি যে নারীবাদ চর্চা বা নারীবিষয়ক সমাজচিন্তার গুরুত্ব কিন্তু ক্রমাগত আরো নতুনভাবে বিকশিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে। এই যে গুরুত্ব, সেটা ঠিক কার কাছে? কার জন্য সেটা প্রয়োজন? প্রয়োজনটা কি শুধু অ্যাকাডেমিক রয়ে যাচ্ছে, দু-একটা পেপার লেখা, কিছু জটিল বক্তৃতা, কয়েকটা পরিসংখ্যান, একটা ক্যারিয়ার? কিংবা দুর্বলের পাশে দাঁড়ানোর বাহ্‌বারঞ্জিত নতুন আরেকটা ক্ষমতার সমীকরণ (The subaltern/woman cannot speak!)? অথবা, বেশ হইচই ফেলে দেওয়া, টিভির পর্দায় মুখ দেখানো, প্রতিবেশীর অগাধ বিস্ময় উদ্রেক করা কদিনের নারীবাদের কাগুজে বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠার প্রমোদের মেলা? এই নারীবাদ চর্চা কি আদৌ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরের পুরুষের চিন্তায় কোনোভাবে ছাপ ফেলতে পারছে?

এখনো অনেকে ছেলেমেয়েদের প্রকাশ্য ধূমপান মেনে নিতে পারে না। কোনো মেয়ে সিগারেট কিনতে গেলে দোকানদার-খদ্দের সবাই বিস্ময়ভরা চোখে তাকায়! অথচ ছেলেদের বেলায় এই বিস্ময়বোধ কাজ করে না। এ ব্যাপারে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরা যেতে পারে। সম্প্রতি একজন তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে বিয়ের প্রসঙ্গ এলে কথায় কথায় বলি, একজন ডাক্তার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলো। উত্তর আসে, তা কী করে সম্ভব! স্ত্রী ডাক্তার হলে বৃদ্ধ মা-বাবাকেই বা কে দেখবে আর সন্তানদের খেয়ালই বা কে রাখবে? আরেক ধাপ এগিয়ে বলি, 'কেন, বাড়িতে একজন ডাক্তার বউ থাকলে মা-বাবার সেবা তো আরো ভালো হবে'। জবাব আসে, বাপ-মায়ের চিকিৎসা তাঁরা নিজের রোজগারে করাবেন, স্ত্রী তাঁদের সেবাযত্নটুকু করলেই যথেষ্ট। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, ধরো তোমার বউ যদি তোমার থেকে বেশি উপার্জন করেন, তা হলে কেমন হবে?' 'মেধাবী' যুবকটি বলে : মেয়েমানুষের রোজগারের টাকায় খাবার কেনা 'হারাম'।

একথা শুনে আমার স্তব্ধ হওয়ার দশা! শুধু পুরুষতান্ত্রিক ধারণাই নয়, ধর্মকেন্দ্রিক একটা বিশ্বাসও নতুন প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে এখনো প্রবল!

আসলে আমাদের দেশে বহু বহু শিক্ষিত যুবক দ্বিধাহীনভাবে এমন ধারণা পোষণ করেন, এবং সমান দ্বিধাহীনভাবে তা প্রকাশ করে থাকেন। আর এমন ধারণা গ্রামের মানুষের পাশাপাশি শহুরে, মধ্যবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত সমাজেও অনুপস্থিত নয়।

শুধু পুরুষতন্ত্র নয়, আমাদের সমাজে 'ভ্রান্ত নারীবাদ'ও বেশ ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে, যে নারীবাদ গড়ে উঠতে চায় পুরুষকে বাদ দিয়ে। ঠিক যেভাবে নারীকে ব্রাত্য করে পুরুষ তার তন্ত্র রচনা করেছে, ঠিক তারই পালটা। আমাদের দেশে নারীর অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দুটি শক্ত বাধেই বারবার ধাক্কা খাচ্ছে। এর একটি পুরুষতন্ত্র, অন্যটি ভুল নারীবাদ। বেশিরভাগ পুরুষ এখনো মানুষ হয় নি, এখনো সে নিতান্ত পুরুষমানুষ থেকে গেছে। আর ভ্রান্ত-নারীবাদীরা ব্যস্ত রয়েছে একপেশে লিঙ্গধারণা (hetero-normativity) খুঁজতে, চুলচেরা সমালোচনা করতে। যে দ্বিত্ব বা 'বাইনারি'র ভাবনা পুরুষতন্ত্রে নারী-পুরুষের বিভাজন তৈরি করে এসেছে, সেই একই বিভাজনের ধারা এই সস্তা নারীবাদেও ক্রমাগত স্থান করে নিচ্ছে। 'আমি যদি তোমার জন্য চা বানাই, তুমি আমার খাবার বেড়ে দেবে' গোছের সহজ সমীকরণ। নারী নির্যাতনবিরোধী আইনের পালটা হিসেবে প্রতিযোগিতায় অশালীন পুরুষতন্ত্র তার ভাগ দাবি করতে পুরুষ নির্যাতনবিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি নিয়ে মাঠে নামে। অনেকটা যেন যৌন বিভাজনের ভিত্তিতে জমি দখলের লড়াই। আমরা কী করব? দুটো দল বানিয়ে হাততালি দেব?

এখানে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন, তা হলো নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের সমাজে এখনো গুরুত্ব পায় নি। নারী নির্যাতনকে এখনো অনেকে নারীর সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন। নারীবাদীদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। নারীর নিরাপত্তার জন্য আইন, পুলিশ, প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ইত্যাদি অনেক কিছুই প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন তা হলো রাষ্ট্রের, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এবং তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মূল্যবোধের একটা মৌলিক এবং স্থায়ী পরিবর্তন।

কেমন হওয়া দরকার সে মূল্যবোধ? যা মেয়েদের শুধু সুরক্ষার পাত্রী হিসেবে দেখে না, স্বাধীনতার অধিকারী হিসেবে দেখে; যে মূল্যবোধ নিরাপত্তার অজুহাতে মেয়েদের ঘরে বন্দি করে রাখে না এবং রাতবিরেতে ঘরের বাইরে পা রাখতে মেয়েদের আটকায় না; মেয়েদের

সালোয়ার কামিজে আপাদমস্তক ঢাকতে বলে না অথবা সর্বদা পুরুষ দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতে বলে না এবং যে মূল্যবোধ সারাক্ষণ মেয়েদের দোষ ধরে না।

সুরক্ষা দিয়ে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নিরাপত্তাহীনতা বা যৌন নির্যাতন সত্যিই বন্ধ করতে হলে আগে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার সোপানগুলোকে ভাঙা দরকার। ভাঙা দরকার প্রচলিত মূল্যবোধ। জাত, ধর্ম, অর্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং পুরুষ আধিপত্যের যোগসাজশ বন্ধ না করলে মেয়েদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ হবে বলে মনে হয় না।

আসলে নারীবাদের প্রকল্পটা নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। নারীবাদের নানা আঙ্গিক ভরসা করে নারী হয়ত বদলে চলবে প্রতিদিন। পুরুষ কিন্তু একই জায়গায় স্থবির। প্রাতিষ্ঠানিক নারীবাদ একজন প্রতিপক্ষ চেয়েছে, যাকে চোখ রাঙানো যায়, শায়েস্তা করা যায় বা ফাঁসিতে চড়িয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যায়। অথচ যে পুরুষের আলোকপ্রাপ্তি প্রয়োজন, সে রয়ে গেছে সেই তিমিরেই। তার দায়িত্ব নেওয়ার কেউ নেই। পুরুষের মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। তবে কিনা, এই কাজ শুধু গাল পেড়ে হবে না, এর জন্য প্রয়োজন যুক্তি, সহমর্মিতা, যত্ন আর শুশ্রূষা। এই মঙ্গলসাধনের ভেতরেই বোধহয় প্রোথিত রয়েছে নতুন ক্ষমতায়নের বীজ।

কিন্তু তার পরেও আর একটি প্রশ্ন থেকে যায়। পিতৃতন্ত্র শেষ বিচারে পুরুষের আধিপত্য নয়, পৌরুষের আধিপত্য। পৌরুষের একটি বিশেষ ধারণার আধিপত্য। সেই ধারণার মূলে থাকে অন্যকে দমন করবার প্রবল তাগিদ। এই মুহূর্তে দেশের রাজনীতির দিকে তাকালেই তার স্বরূপ বুঝে নেওয়া যায়। যে উগ্র, 'অপর-বিদ্বেষী' রাজনীতির আঁচ দেশজুড়ে চলছে, তার অন্তরে নিহিত রয়েছে অতিপৌরুষ। আধিপত্যকামিতার প্রবল আগ্রহ। জনসমাজেও এই উগ্র অতিপৌরুষের প্রভাব দ্রুত ভাঙছে, সংখ্যাগুরুবাদী রাজনীতি তা থেকে রসদ সংগ্রহ করছে এবং তাকে লালনও করছে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে না পারলে, সমাজ ও রাজনীতিতে উদার সহমর্মিতার সুধর্মকে ফেরাতে না পারলে পিতৃতন্ত্রই বিজয়ী হবে। ব্যক্তি-নারীর সাফল্যের মাত্রা যাই হোক না কেন।

চিররঞ্জন সরকার প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট। chiroranjan@gmail.com